তপন কান্তি ঘোষ

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আমরা একটু আগে *'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'* কবিতাটির আবৃত্তি শুনলাম। এই কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী কবির যে আর্তি তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। আবার একই সঙ্গে সে সময়ের মার্কিন সরকারের অবস্থানের কথা জানি এবং সেটাও কঠিন অবস্থানে ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের সরকারের অবস্থান ছিল। একই সঙ্গে ভিয়েতনামে, সেটিও মার্কিন কবির কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে, সেখানেও তখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আমি জানি যে ১৯৬৯ সালে হো চি মিন ভিয়েতনামের অবিসংবাদিত নেতার মৃত্যু হয়। তারপরও তুমুল যুদ্ধ চলেছিল, তার বর্ণনা এ কবিতায় আছে। সুতরাং এ কবিতায় শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের অনান্য জায়গায় মুক্তিকামী জনতার সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের বিরুদ্ধে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, সেটিও প্রস্ফূটিত হয়েছে। এখানে যাঁরা শরণার্থী শিবিরে গিয়েছে তাদের চরম কষ্ট দুঃখ বেদনা এবং পিছনে ফেলে আসা তাঁদের স্মৃতি বা অনেক মানুষকে তাঁরা হারিয়েছেন সেই কষ্টগুলোর কথা তিনি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। আজকে আমি জানি না সঠিকভাবে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব কি-না। আসলে এই ভিডিও চিত্রে যেসব ছবি দেখানো হয় তা যখনই দেখি তখনই আমার মনে হয় যে এর মধ্যে দিয়ে আমিও হেঁটে যাচ্ছি। হাফপ্যান্ট পরে একটি জামা গায়ে এরকম অনেক কিশোর হেঁটে যাচ্ছে, তার মধ্যে হয়ত আমিও আছি, এটা সব সময় মনে হয়।

১৯৭১ সালে আমি তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। আমাদের উপজেলা খুলনা জেলার পাইকগাছা। যে স্কুলে আমরা পড়তাম সেই স্কুলটি এই উপজেলায় যাওয়ার প্রধান সড়কের পাশে হওয়াতে কিছু উত্তাপ সত্তর-এর নির্বাচনের সময় থেকেই আমরা পেয়েছি। সে সময়ের একটা কথা কানে বাজে, দাঁড়িপাল্লায় দিলে ভোট, শান্তি পাবে দেশের লোক। তারপরে কি শান্তি পেয়েছিল মানুষ, দেশের মানুষ, আমরা সবাই জানি।

আমার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। এলাকায় যেহেতু তিনি শিক্ষক, তারপর জমিজমা মাপার জন্য আমিন হিসাবে কাজ করতেন, এলাকায় একটা প্রভাব ছিল সবার মধ্যে। একাত্তর সালে ওই অঞ্চলটি খুব দুর্গম থাকায় সবাই আশ্বাস দিত আমাদের যাওয়ার দরকার নাই ভারতে। বাবা-মাও অনেক দিন চেষ্টা করেছেন যে না-গিয়ে যদি থাকা যায়। এ জন্য আমরা জুলাই মাসে ভারতে যাই। শরণার্থী জীবন থেকেও আমাদের যাওয়াটা, যাওয়ার জন্য যে বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে সেটা খুবই কষ্টের মনে হয়। সেটার কথাই বেশি মনে আছে এই জন্য যে, ভারতে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের এক আত্মীয়ের বাসায় থাকার সুযোগ পাই। যদিও অনেক কষ্টের এবং যে রেশন আমরা পেতাম সেই রেশনের উপরে আমাদের চলতে হতো, তারপরেও শরণার্থী জীবনের সেই চরম কষ্ট হয়তো আমরা ওই জন্য পাইনি। কিন্তু যাওয়ার পথে আমরা অনেকবার অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় পড়েছি। আমরা একযাত্রায় যেতে পারিনি। দেখা গেছে প্রথম যেদিন আমরা রওয়ানা হই, কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে গিয়ে কয়েকদিন থাকি। তারপর ওখান থেকে নৌকায় রাতের বেলায় লুকিয়ে যাওয়া সেই কপোতাক্ষ নদীর উপর দিয়ে। এমন হয়েছে যে, দুইবার দুই দিন রাতে অনেক দূর নৌকায় গিয়ে আবার খবর পেয়েছি যে সামনে রাজাকার পাহারা দিচ্ছে বা দাঁড়িয়ে আছে। তখন ফিরে আসতে হয়েছে। এরকমভাবে আমরা কয়েকবারের চেষ্টায়, পাটকেলঘাটা বলে একটা জায়গা আছে সাতক্ষীরা যাবার পথে, সেখানে গিয়ে আমরা এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠি। সেখানের আশপাশে আগে থেকেই জড়ো হচ্ছিল শরণার্থী। আমরা ওখানে কোনভাবে রুটি খেয়ে কয়েকদিন থাকি। আবার অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে একদিন আমরা পাটকেলঘাটা থেকে সাতক্ষীরা শহর হয়ে কলারোয়ার ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমরা জুলাই মাসের শেষে যাচ্ছিলাম তখন প্রধান সড়ক দিয়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক ছিল, যে কোন সময় জীবন চলে যেতে পারে। আমরা যেদিন সাতক্ষীরার দিকে যাচ্ছি সেদিন পাটকেলঘাটা-সাতক্ষীরা রাস্তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কনভয়ের সামনে পড়ে যাই। কিভাবে যেন লোকজন আগে থেকেই খবর পেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বলে, পালাও পালাও, পাকিস্তানি আর্মি আসছে, আর্মির জিপ আসছে। খবরটা শোনামাত্র আমরা যে বাসে চড়ে সাতক্ষীরা যাচ্ছিলাম সবাই সেই বাস থেকে নেমে দৌড়ে পাশের একটা আম-বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ি। আম-বাগানের ভিতরে যাবার পরপরই বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির মধ্যেই চরম ঠাণ্ডায় আমরা জঙ্গলে বড় একটা গাছের নীচে বসে থাকি। মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছেই তো পড়ছে। ভিজে সবাই একাকার। বাগানে অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর খবর পাই পাকিস্তানি আর্মির জিপ চলে গেছে, এখন আবার যাওয়া যায়।

এ অবস্থায় আমরা সবাই বাগানের ভিতর থেকে বের হয়ে কীভাবে যাই, মনে নাই, সম্ভবত ভ্যান বা অন্য কিছু দিয়ে সাতক্ষীরা শহরে যাই। সেখান থেকে আবার আমরা কলারোয়ার বাসে উঠি।

সাতক্ষীরা থেকে কলারোয়া যাবার পথে মাধবকাঠি বলে এক জায়গা (এখানে আমার আর পরে যাওয়া হয়নি। এখন ভাবছি আমার যাওয়া দরকার গ্রামটার সেই বাজারটায়) সেখানে বাজারে রাজাকাররা টহল দিচ্ছে। লোকজনকে বাস থেকে নামিয়ে সব যাত্রীকে পরখ করত যে কেউ মুক্তিবাহিনীতে যাচ্ছে কিনা বা সোনাদানা নিয়ে যাচ্ছে কিনা। পরে জানা গেল তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল শরণার্থীদের কাছ থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া। সেদিন আমাদের সাথে পাটকেলঘাটার একজন লোক ছিলেন যার নাম সম্ভবত নেপাল ঘোষ। তার কাজ ছিল অনেকের টাকা পয়সা ও সেনাদানা পার করে দেওয়া। কেননা তার সঙ্গে বর্ডার এলাকার এক লোকের সাথে পরিচয় ছিল। তিনি ওই দিন অনেক পরিবারের সোনাদানা এবং টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজাকাররা তাকেসহ আমাদের সবাইকে ওখান থেকে মাধবকাঠি বাজারের একটি দোকানে আটকে রাখে। কয়েক ঘণ্টা ধরে সবাইকে তল্লাশি করে যখন তাকে ধরে তখন তার কাছে অনেক টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার পায়। তার কাছে অনেক জিনিস পাওয়াতে আমাদের কারো উপরে অত্যাচার করেনি, কিন্তু বসিয়ে রেখে বিকালের দিকে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দেয়ার সময়টি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না, সম্ভবত বিকাল চারটা কি পাঁচটা হবে। ছেড়ে দেবার পর তিনি আর ভারতের দিকে যান নাই, ফিরে চলে যান। আমরা যেতে থাকি এবং আমাদের সাথে আরেকটি পরিবার ছিল তারা আমাদের আগে আগে চলে।

তখন আমি চলছি আমার বাবা, আমার মা, আমার পরের দুই ভাইসহ। আমার এক ভাইয়ের বয়স পাঁচ মাস, সে মায়ের কোলে আর আমার পরের ভাইটি বোধ হয় দুই থেকে তিন বছর হবে, সে বাবার কাঁধে। আমি হেঁটেই যাচ্ছি। দেখা গেল আমি সবার আগে বাবার সঙ্গে হাঁটছি, আমার মা পিছে পিছে আমার ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে হাঁটছে। প্রচণ্ড কাদা, এত বেশি কাদা যে মনে হয় একাত্তর সালে খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছিল। মাধবকাঠি বাজার থেকে সোনাই নদী পর্যন্ত পথ। সীমান্তের ওপারে বশিরহাট। অনেকটা পথ হাঁটতে হাঁটতে যাই। প্রচণ্ড কাদার মধ্যে আমার পা বারবার আটকে যাচ্ছিল। কোথায় যাব ঠিক নাই। যখন অন্ধকার হয়ে আসছে তখন দেখি আরও অনেক পরিবার সামনে যাচ্ছে। বর্ডার এলাকায় পৌঁছে দেখি রাজাকার লোকদের আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং মালামাল রেখে ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে একটা জায়গায় বসিয়ে রাখে, তারপর মালামাল চেক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তখন আমাদের ছেড়ে দেয়। কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে সোনাই নদীর খেয়াঘাট পার হয়ে ওপারে যখন যাই তখন রাত হয়ে গেছে। ওপারে যাওয়ার পরে আমাদের মধ্যে একটা বিরাট স্বস্তি। যদিও পথ খুব বেশি নয় কিন্তু আমরা অনেক দিন ধরে পথ পাড়ি দিয়েছি এবং বিশেষ করে শেষ দিনটিতে আমরা হয়তো ওখানেই মারা যেতাম, যখন পাকিস্তানি জিপ যাচ্ছিল অথবা মাধবকাঠিতে যখন রাজাকাররা আমাদের ধরে রাখে। সুতরাং আতংকের মধ্য দিয়েই যাচ্ছিলাম এবং তার সাথে প্রকৃতি বিরূপ ছিল। এই কষ্ট এবং ত্রাসের মধ্য দিয়ে আমরা যখন সোনাই নদী পার হয়ে ওপারে যাই তখন সবার মধ্যে উচ্ছাস দেখতে পাই। আমার বাবা মায়ের মাঝে যে উচ্ছাস তা এখনও আমার চোখে ভাসে।

সেখান থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর গিয়ে ইছামতি নদী পার হয়ে গভীর রাতে বশিরহাটে গিয়ে পৌঁছাই। আমরা যখন ইছামতি নদীর পারে আসি তখন ওপারে শহরে আলোকরেখা দেখা যায়। আগেতো আমরা বিদ্যুতের আলো দেখিনি, তখন মনে হচ্ছিল যেন অমাবস্যার পরে আলোর হাতছানি বা আলোকজ্জ্বল জায়গায় যাচ্ছি, নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছি। নদী পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে আর যাওয়া সম্ভব না হওয়াতে আমরা ওখানে রাস্তার পাশে একটা স্কুলের বারান্দায় থাকি। সকালে আবার ওখান থেকে কয়েক মাইল দূরে খোলাবোরখা বলে একটি জায়গা আছে সেখানে আমাদের এক আত্মীয় থাকেন সেদিকে হাঁটতে থাকি। সেখানে গিয়ে আমরা আত্মীয়ের বাড়িতে থাকায় ওপারে যাওয়ার পর শরণার্থীদের যে কষ্টের জীবন সেটা হয়তো পাই নাই, যদিও সেখানে অনেক ছোট জায়গার মধ্যে কষ্ট করে এবং রেশনের চাল ডাল খেয়ে থাকতে হয়েছে। বিশেষ করে আলু খেতে হত এবং শুধু আলু দিয়ে তৈরি আলুর দম এটা প্রথম জানি সেখানে গিয়ে। আমরা খুলনা দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষ, সব সময় মাছে ভাতে বাঙালি। আলু খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়নি, এই করুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে এখানে আসার পর।

শরণার্থী জীবনের আরও অনেক অভিজ্ঞতা আছে, তবে আমার মনে হয় এই যাত্রা, শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগের পথের যে ঘটনা, যে কষ্ট, অনিশ্চয়তা, সন্ত্রাস এবং বিপদসংকুল পথ পাড়ি দেওয়া– সেটাই সবচেয়ে স্মরণীয়।

এরকম আর অনেক ঘটনা আছে। আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে সাতক্ষীরার তালা উপজেলার মুখে কপোতাক্ষ নদী পার হয়ে যে বাড়িতে প্রথম আমরা ছিলাম সেখান থেকে আমরা চলে আসার একদিন বা দুই দিন পরে ঐ বাড়ির মালিকরাও চলে যান। রাজাকার দল তাদের চলে যাবার সংবাদ পেয়ে ঐ বাড়ির উদ্দেশ্যে আসে। পরিবারের অন্য সদস্যরা সবাই যখন নৌকায় উঠেছে এবং নৌকা ছেড়ে দেবে তখন বাড়ির মালিকের মনে পড়ল তিনি জমির দলিলটা রেখে এসেছেন। তিনি দলিল আনার জন্য আবার বাড়ি ফিরে যান। ততক্ষণে রাজাকার দল চলে আসে এবং তাকে ওখানেই হত্যা করে। উনার হত্যার খবর পেয়ে আত্মীয়রা নৌকা ছেড়ে দেয় এবং শরণার্থী হয়ে চলে যায়। এই ঘটনা যখন আমরা পাটকেলঘাটায় এসে শুনি তখন শিহরিত হয়ে পড়ি এবং আতংকিত হই যে, আমরা সেখানে যদি আরও দুই দিন থাকতাম তাহলে তাদের সাথে আমরাও মারা পড়তাম। এরকম অনেক কাহিনী আছে। যে সমস্ত পরিবার আটকা পড়েছিলেন বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহ্য করেছেন, যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছেন তাদের প্রত্যেকেরই কাহিনী আছে। শরণার্থী জীবন নিয়ে আসলে খুব বেশি লেখা আমার মনে হয় হয়নি। লেখা হয়নি সাহিত্য বা স্মৃতিচারণ। আমার মনে হয় সেকথা অনেকে লিখতে পারেন যারা শরণার্থী হয়ে গিয়েছেন। আত্মীয়ের বাড়িতে থাকা, সে জীবনেরও অনেক কাহিনী আছে।

আমি একটা কথা বলে শেষ করব। আসলে পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টের কথাগুলো যে ভুলে যাওয়া হয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার এলাকা পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনির একজন বীরাঙ্গনা, নাম গুরুদাসী মণ্ডল। স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটবেলায় আমরা তাকে পাগলী হিসাবে জানতাম। কখনই জানতাম না যে তিনি একজন বীরাঙ্গনা। দেশের জন্য তার চরম যে ত্যাগ, স্বামী ও চার সন্তানকে তার চোখের সামনে রাজাকার বাহিনী হত্যা করে এবং তাকে ক্যাম্পে তুলে দীর্ঘদিন অত্যাচার চালায়- এই কথা আমরা জানতে পারি যখন ১৯৯২ সালে গণআদালতের রায়ে মানবতা বিরোধী অপরাধীদের দন্ড দেয়া হয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম, তখন আমি সেই গুরুদাসী মণ্ডলকে দেখি আমাদের এলাকার বাসে উঠতে। তারপর আমার এক ভাই বলেছেন যে, আমাদের এলাকার একজন মুক্তিযোদ্ধা বই লিখেছেন সেখানে গুরুদাসীর কথা লেখা আছে তিনি একজন বীরাঙ্গনা, তার চরম আত্মত্যাগের কাহিনী। এই যে সময়টা সেই ১৯৯২ তে আবার স্মৃতিতে তাঁর ফিরে আসা যিনি চরম আত্মত্যাগ করেছেন দেশের জন্যে, মাঝখানে কিন্তু বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি কারণ পরবর্তীতে তাঁর সাথে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে, তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেন এবং কথা বলতেন আমাদের আঞ্চলিক বাংলায়। তাঁকে নিয়ে আরেকটা বড় কাহিনী বলা যায়। এখনও তাঁকে আমরা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরকারি স্বীকৃতি ও গেজেটভুক্ত করতে পারি নাই। আমি মন্ত্রণালয়ে আসার পর আমার প্রধান কাজ আমি সেটা হাতে নিয়েছি। এবং বিশেষ করে শুধু তাঁকে না, আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি যে বীরাঙ্গনাদের কিভাবে আরও সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করা যায়। আমি আজকে সকল বীরাঙ্গনা মায়ের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কারণ তাঁদের অবদানের বিষয়টি আসলে অনেক দিন আমাদের সামষ্টিক স্মৃতি থেকে হয়ত হারিয়ে গিয়েছিল বা এখনও কম উচ্চারিত হয়ে থাকে। আমি আশা করি সকলের সহযোগিতায় আমরা এই দিকটায় অনেক কাজ করতে পারব। আমি যতদিন এই মন্ত্রণালয়ে আছি বীরাঙ্গনাদের অবদানসহ অন্যদের মুক্তিযুদ্ধে অবদান নিয়ে যদি কিছু কাজ করে যেতে পারি সকলের সহযোগিতা নিয়ে, তাহলেই আমার ভাল লাগবে। কারণ আমি যে শরণাথী হিসাবে গিয়েছিলাম ভারতে, তার ৪৯-৫০ বছর পরে এসে আজকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাব বা কিছু কাজ করতে পারব এটা কখনও ভাবি নাই। আজক যখন সেটা পেয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমার এই কথাগুলো বলতে পারার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকসহ রফিকুল ইসলাম ও অন্যদের ধন্যবাদ জানাই।